Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই চৈত্র, ১৪৩০ / 24.03.2024

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
নিত্য আনন্দময় পুরুষ শ্রী নিত্যানন্দ	ডাঃ রুহিদাস সাহা
মহাভারতের উপাখ্যান	ভস্মলোচন
সার্থক ভ্রমণ আমার	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
মরণোত্তর	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Introduced by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine: RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

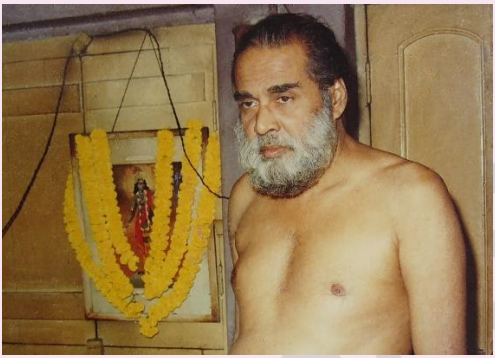

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযম এর দ্বারা। আত্মসংযম মানে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

DO NOT COPY

পার্থসারথি এবার (জুন, ১৯৯১) ৩২ বছরে পড়লো। দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যায়, হিসেব করা যায় না। আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম ১৯৮৬ সালের সেই ২৪শে নভেম্বরের পর এই পত্রিকাটিকে আর চালাতে পারবো? পারলাম। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতি যাঁরা পত্রিকাটি পড়বার জন্য সারা মাস অপেক্ষা করে থাকেন এবং গ্রাহক সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেন।

আমার খুব ভালো লাগে যখন পাঠক পাঠিকারা ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে আমার একটি অলিখিত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। চিঠিপত্র লেখার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন গড়ে উঠেছে।

এবার পার্থসারথির নব জন্মদিনের প্রাক্কালে দেশের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয় ঘটে গেলো। রাজীব গান্ধী দক্ষিণ ভারতে শ্রীপেরামপুদুরে নিহত হলেন। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য। আমি রাজনীতির কিছু না বুঝলেও এই ক্ষতিটা মেনে নিতে পারছি না। আমার শুধু সেই হাসি মুখটি মনে পড়ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতবার তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি! সেই একই গতিতে।

ইন্দিরা গান্ধী যখন নিহত হয়েছিলেন, তখন শ্রী প্রীতিকুমার কি দুঃখ পেয়েছিলেন তা বলবার নয়! তখন চোখে দেখতে পেতেন। সারাদিন T.V. ও Radio-র পরিবেশিত সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতেন।

ভি.পি. সিংয়ের খবরগুলি খুব মন দিয়ে পড়তেন, আলোচনা করতেন। একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন- "ভি.পি. সিং তো প্রধানমন্ত্রী হবেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম – "রাজীব গান্ধী কোথায় যাবেন?" উনি একটু থেমে বললেন – "ওঁকে কি আর রাখবে? ওঁকে তো মেরে ফেলবে।"

১৯৮৯ সালে শ্রী রাজীব গান্ধী নির্বাচনে হেরে গেলেন। ভি.পি. সিং প্রধানমন্ত্রী হলেন। আমি ভাবলাম শ্রীপ্রীতিকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী একটি খাটলো, বাকীটা আর খাটবে না। কিন্তু গীতাদি যেমন বলে – "দাদার কথা বেদবাক্য। চন্দ্র সূর্য্য ওঠা যেমন সত্য, দাদার কথাও সেই রকম খাটবে এটা জেনে রেখো।"

রাজীব গান্ধী নিহত হবার খবরটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগে শ্রী প্রীতিকুমারের বলা কথাগুলি মনে পড়ে গেলো। খুব Normally কি দারুণ ভাবে বলে দিতেন ভবিষ্যতের কথা তা চিন্তা করা যায় না।

আমাকে সংসার সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন চলে যাবার তিনমাস আগে। আমি শুনতে চাইনি। জোর করে বলেছিলেন – "তোমাকে শুনতেই হবে – আর সময় হবে না।" যা বলেছিলেন তা এখনও ঘটেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, শেষের দিন দুপুরে আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন, তার জন্যই কি decision বদলে দিলেন? জবাব পাই না। তবু গীতাদির মতো করে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি। দেখা যাক .....।

আমার পুত্তরের তার বাবার উপর অগাধ ভরসা, আমি মাঝে মাঝে ভয় পাই। মাঝে খুব পূজা পূজা, গঙ্গাস্নান মন দিয়ে করতাম। সকালে যখন গলদঘর্ম হয়ে কাজ করতে হয় তখন ঐ পঞ্চশিব আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়ে নেয়। ভিতর থেকে ভক্তির প্রাবল্য উপলব্ধি করতে পারিনা। এটা আমারই দোষ। তবে একটা কথা ঠিক এখনও শ্রীপ্রীতিকুমারকে জোর করে যে কথা বলি সেটা কেমন করে যেন খেটে যায়। ঐটুকুই ভরসা। কিন্তু আমি বাড়িটাকে তো আর লোকজনে ভরিয়ে তুলতে পারছি না। তাঁর চোখের মণি ছিল যারা, তাদের আমরা আজ সাড়ে চার বছর দেখিনি, ছুঁই নি। বিধাতা পুরুষের একি পরিহাস! যদি তিনি শেষ দিনে আমার উপর রাগ না করেন, তাহলে তো তাঁর কথাটা খাটবে? আর যদি রাগ করেই থাকেন, তাহলে আমার অন্য প্রার্থনাগুলো শোনেন কি করে? আমি অবশ্য যখন

তখন যা ইচ্ছে তাই চাই না। দুঃখভোগ তো করতেই হবে! নিজের প্রারব্ধ নিজেকেই খণ্ডন করতে হয়। তাই সব দুঃখ সহ্য করবার চেষ্টা করি।

কথায় বলে - Out of sight, out of mind. সব জিনিষ যে Out of mind হয়, তা নয়। সেই স্পর্শকাতরতা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আমি কোন ঘটনাই ভুলতে পারি না। তবে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি – ভালো আছি। ওর থেকে সহজ জবাব আর কিছু নেই।

গত ২৮শে মে মান্তুর বিয়ে হোল। কিশোর এখন পাখীর মতো ডানা মেলে উড়বার কথা ভাববে। বেচারা এতদিনে দায়মুক্ত হোল। শ্রীপ্রীতিকুমার একটু সময় নিলেন। শ্রী রাজীব গান্ধী, ভি পি সিং সম্বন্ধে বলা কথা যদি ৫ থেকে ৭ বছর লাগে, তাহলে আমাকে forecast করা কথাগুলি ঘটতে কতদিন লাগবে? দেখি .....

এই প্রথম গরমের ছুটিতে আমি কোথাও গেলাম না। বাড়ি থেকে বেরোতেও ইচ্ছে করে না। দেখলাম সময় বেশ কেটে যায়। কোনও অসুবিধেই হয়না। আসলে মানুষ অভ্যাসের দাস। আমি আগে একা বাড়ি থাকবার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না, এখন কোনও অসুবিধে হয় না। মনে হয় শ্রীপ্রীতিকুমার তো শুয়েই আছেন খাটে। ভয় কি? লিখতে লিখতে কত কথা মনে পড়ে যায়। তখনকার দিনগুলোর সাথে এখনকার দিনগুলোর তুলনা করে এটুকু বুঝি, সময়ই মানুষকে তার নিজের মতো করে তৈরি করে দেয়।

শ্রী রাজীব গান্ধী নিহত হবার পর আরও অনেকে প্রয়াত হলেন। পশ্চিম বাংলার শ্রী প্রভাস চন্দ্র রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী দীনেশ গোস্বামী, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শ্রী ডাঙ্গে। শ্রীপ্রীতিকুমারকে এখন আর পড়ে শোনাতে হয় না, কিন্তু আমি খুব মন দিয়ে কাগজ পড়বার চেষ্টা করি। আগে আমরা কাগজ হাতে পেতাম না। শ্রীপ্রীতিকুমার যতক্ষণ বাড়ি থাকতেন, খবরের কাগজগুলোও থাকতো তাঁর নাগালের মধ্যে। একটু সময় পেলে আইন-আদালত, পথ দুর্ঘটনা ও

interesting খবরগুলি পড়তাম। প্রথম পৃষ্ঠা তখন স্পর্শ করতাম না। এখন কিন্তু সেই প্রথম পৃষ্ঠাতে অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে নিই। নিজেই অবাক হয়ে যাই। যে কাজ আগে করিনি, সে কাজ এখন কি করে করি?

অনেকে আমাকে বলেন শ্রীপ্রীতিকুমারের অল্পবয়সের ঘটনাগুলি জানাতে। সেই সময়টা এতো রোমান্টিক ছিলেন তিনি যা টপ করে প্রকাশ করতে অসুবিধা হবারই কথা। অসম্ভব আধুনিক ছিলেন। ৩০-৩১ বছর বয়সে একটি জামা বা ধুতি বা একজোড়া জুতো দু'বার পরতেন না। জুতো সম্বন্ধে খুব দুর্বলতা ছিল। বাচ্চা ছেলের মতো আবদার করতেন – "আমাকে ঐ Design এর জুতো কিনে দেবে?" অন্য কেউ যদি কিনে দিতেন তাঁকে দাম দিয়ে দিতেন। নিদেন পক্ষে একটি টাকা হাতে গুঁজে দিতেন। বলতেন – অন্যের পয়সায় জুতো পরতে নেই। আমার তখনকার Salary যদি এখনকার মত হত আমি তাঁকে অনেক কিছুই দিতে পারতাম। আজ আমার সেজন্য খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তবুও তিনি জন্মদিনে তাঁর পছন্দ মত জিনিষগুলিই পান। তাঁকে আমরা কেউই ভুলিনি। কেউই হিসাবের বাইরে রাখিনি। তিনি আমাদেরই একজন। তিনি খেলে আমরা খাব, তিনি শুলে আমরা শোব। ব্যক্তিগতভাবে কারো নাম না লিখেও বলতে পারি তাঁর কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, আমি তাদের কাছাকাছি রাখবার চেষ্টা করি। যাদের সম্বন্ধে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, উপস্থিতি সহ্য করতে পারেন নি, আমি গত চার পাঁচ বছর তাদের নিয়েও চলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখলাম মানুষ তার জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। নিজের সুখের জন্য সে যে কোনও আশ্রয় নিতে পারে। কোনও নীতি মানে না। আমি ধীরে ধীরে তাদের ত্যাগ করেছি। শ্রীপ্রীতিকুমারের ধারণার সাথে মিলিয়ে নিয়েছি। তিনি যে সংস্কার বদলাতে পারেন নি, আমি সে সংস্কার বদলে দেবো কি করে? সুতরাং আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমাকে ছাড়ো, একটু শান্তিতে থাকতে দাও। এই ভাবেই দিন কাটছে।

পার্থসারথির জন্মদিনে তার পাঠকবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা সামান্যতম সাহায্য করেছেন তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। নাম আর উল্লেখ করলাম না, কারণ

বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত দাতা এবার নেই। পাঠকরা যদি নিয়মিত চিঠিপত্র লেখেন তাহলে যোগাযোগটা থেকেই যায়, বুঝতে পারি তাঁরা কে কেমন ভাবছেন। পার্থসারথির কয়েকজন গ্রাহক দেহত্যাগ করেছেন, ডঃ পি সি মুখার্জী, শ্রী বামন দাস লাহিড়ী তাঁদের অন্যতম। তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি।

ত্রুটি আমাদের অনেক আছে। হয়ত সকলের পছন্দ হয় না সব লেখা। কিন্তু আমি নিরুপায়! যদি আমার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা শ্রীপ্রীতিকুমারের গার্হস্থ্য জীবনটা দেখতেন তাহলে স্বীকার করতেন আমার কলম দিয়ে গোলাগুলি বেরোনো উচিত ছিলো। তবু এখন অনেক সংযত হয়েছি। মনে হয় কি দরকার অন্যকে correction করবার। সব চেয়ে আগে নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করি না কেন?

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – জুন, ১৯৯১)

নিত্য আনন্দময় পুরুষ শ্রী নিত্যানন্দ **ডাঃ রুহিদাস সাহা**

'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই হয় আমার প্রাণ রে।' – আকাশ-বাতাস আন্দোলিত করে এক সন্ন্যাসী গেয়ে চলেছেন পথে পথে। যাকে দেখছেন তাকেই বলছেন – "তোমরা সকলে সেই পরম পবিত্র গৌরাঙ্গ নাম জপ কর, গৌরাঙ্গ নামে যে পরম পুরুষ অমৃত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এই জগতে – তাঁর ভজন কর। তাতেই তোমার আমার জাতির মঙ্গল। কারণ তিনি যে পরিপূর্ণ শুভময়তার প্রতীক, তিনি যে অসীম মঙ্গলের যথার্থ প্রতিমূর্তি।"

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে আকুল আবেদন জানিয়েছেন নিত্যানন্দ। এই আকুলতার

মাধ্যমেই তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি গৌরগত প্রাণ, গৌরাঙ্গই তাঁর প্রাণের ঠাকুর, গৌরাঙ্গই তাঁর জীবন-দেবতা।

নিত্যানন্দের বাল্যনাম কুবের। ১৩৯৫ শকাব্দের (১৪৭৪ সালে) মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মায়ের নাম পদ্মাবতী দেবী। বাল্যেই তাঁর মধ্যে ব্যতিক্রমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর দশটি বালকের মত তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদাসীন। অন্যান্য বালকদের নিয়ে তিনি ভগবানের লীলাভিনয় করতেন। বিস্মিত হতেন দর্শকবৃন্দ। পুত্রের ভগবানে ভক্তি দেখে অভিভূত হতেন ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা। এইভাবেই চলছিল সবকিছু। কুবেরের বয়স যখন বারো, তখন এক ঘটনা ঘটে গেল। এক সন্ন্যাসী এলেন হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে। ধর্মপ্রাণ গৃহকর্তার কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেলেন, একটি ভিক্ষা চাইলেন। ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা অতিথিকে ভিক্ষা না দিয়ে কি পারেন? রাজী হলেন। সন্ন্যাসী বললেন, সঙ্গী হিসাবে আমি আপনার পুত্র কুবেরকে চাই। প্রাণাধিক পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনার আশঙ্কায় বিমর্ষ হলেন হাড়াই পণ্ডিত, কিন্তু ধর্মের প্রতি অধিক আনুগত্যে পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনাও ভুলে গেলেন তিনি। সাশ্রুনয়নে সন্ন্যাসীর হাতে প্রাণাধিক পুত্রকে তুলে দিলেন।

নতুন-জীবন শুরু হল কুবেরের। নাম হল নিত্যানন্দ। আনন্দের ভাণ্ডার নিত্যানন্দ সানন্দেই এই পথ গ্রহণ করলেন। চলার পথেই যে তাঁর আনন্দ। ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন তিনি। ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে ভারতের ভয়াবহ হীনাবস্থা তাঁর চোখ এড়ালো না। কি দেখলেন তিনি? দেখলেন সর্বত্র শুধু অত্যাচার আর অনাচার। ভারতজোড়া ধর্মীয় বিদ্বেষ। একে কেন্দ্র করে সর্বত্র ভীতি আর ভীতি, ভয়মিশ্রিত কান্না। আনন্দময় নিত্যানন্দের হৃদয়ও বেদনার্ত হোল। ঈশ্বর আবির্ভাবের

প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁরই খোঁজে পথে পথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কত সাধু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এলেন। ভারতের এক অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বীর সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরীর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণ পুরীকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। আনন্দই যাঁর স্বভাবধর্ম সেই নিত্যানন্দের তাতেও তো মনে আনন্দ ফিরে এলো না। মন তাঁর যাঁকে খুঁজছে তাঁর সন্ধান তো তিনি পাচ্ছেন না। কত মহাপুরুষের সান্নিধ্যেই তো তিনি এসেছেন, কিন্তু কারও মধ্যে তো তিনি সেই রূপ সেই লক্ষণ প্রত্যক্ষ করছেন না। কিন্তু তাঁকে যে তাঁর পাওয়া চাই-ই। তাঁকে না পেলে যে তাঁর এতো পথ চলাই ব্যর্থ হয়ে যায়! জীবনের অন্য নাম যে হয় মৃত্যু। তাই এখানেই থামলে তো তাঁকে চলবে না। তাঁকে তো চলতেই হবে। মন যাঁকে চায়, চলার মধ্য দিয়ে তো তাঁকে পেতেই হবে।

আবার চলতে থাকেন নিত্যানন্দ। ভাবের মানুষ নিত্যানন্দ। পরিধানেও সেই ভাবেরই প্রকাশ। তাঁর কাঁধে একটি স্তম্ভ, বাঁ হাতে বেত্রবান্ধা কানাকুম্ভ, পরণে ও মস্তকে নীল বস্ত্র, বাম শ্রুতিমূলে একটি কুণ্ডল – যেন সাক্ষাৎ হলধর। নিত্যানন্দ অবধূত, উদার সংস্কারমুক্ত পুরুষ। গণতান্ত্রিক চেতনার মূর্ত প্রতীকও তিনি।

নিত্যানন্দের মনে বারবার প্রশ্ন জাগছে – কোথায় তাঁর ধ্যানের পুরুষ যাঁর খোঁজে ব্যাকুল হয়েছেন তিনি? কোথাও তো তিনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কি তিনি আসেন নি? দেশের এই ভয়াবহ দুর্দিনেও কি তিনি আসার প্রয়োজন বোধ করেন নি? তা তো হতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রথের সারথি রূপে তিনি যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন তবে তা কি মিথ্যা? কিন্তু আশ্বাসবাণী তো মিথ্যা হতে পারে না। তাঁর মন তো বলছে তিনি এসেছেন, তাঁর অন্তর বলছে বঙ্গভূমিতেই তাঁর

DO NOT COPY

আবির্ভাব ঘটেছে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর শিষ্যদের কাছেও তো তিনি তেমন ইঙ্গিতই পেয়েছেন।

অবশেষে বিশ বছর ধরে পথ চলা শেষ করে বত্রিশ বছর বয়সে নবদ্বীপে এসে প্রথমে নন্দন আচার্যের গৃহে উঠলেন নিত্যানন্দ, ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষা মনে তখন তীব্র। এদিকে নবদ্বীপে জ্ঞানী-গুণী-সুধীসমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্বীকৃত হয়েছে, স্বর্গীয় মাধুরিমায় এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে নবদ্বীপে। নন্দন আচার্যের গৃহেই নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পেলেন। তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। এবার তিনি বুঝতে পারলেন এতদিন ধরে তিনি যাঁকে খুঁজছেন সেই পুরুষই আজ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নিত্যানন্দ। উভয়ের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। মূর্ছিত হলেন নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মূর্ছাভঙ্গ হলো নিত্যানন্দের। তাঁর জীবন-সূর্য নব-প্রভাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ভারতের প্রায় সকল তীর্থে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে নিত্যানন্দ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি বুঝতে পারলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা ভগবত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়ভুজ মূর্তিও দেখেছিলেন। শ্রীবাসের গৃহে অষ্টাদশ প্রহরব্যাপী মহাপ্রকাশাভিষেকে অদ্বৈত-শ্রীবাস-গদাধরসহ উপস্থিত বহু জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে নিত্যানন্দও সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় স্থির নিশ্চিত হয়ে সচন্দন তুলসীমঞ্জরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের পুজো করলেন।

নিত্যানন্দ শিশুর মতই সহজ সরল, মুখে তাঁর মধুর হাসি। প্রাণচাঞ্চল্য আর প্রাণপ্রাচুর্যতায় ভরা তাঁর চরিত্র। দেহখানাও তাঁর সুন্দর, সুঠাম। তেজস্বিতা আর

সাংগঠনিক প্রতিভাও তাঁর চরিত্রের ভূষণ। সর্বোপরি তিনি একজন উদার সংস্কারমুক্ত পুরুষ। এইসব মহিমায় উদ্ভাসিত নিত্যানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ সাদরেই গ্রহণ করলেন, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। বঙ্গদেশে তথা ভারতের বুকে ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন ঘটাবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাতে প্রধান সৈনিকের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন নিত্যানন্দকে।

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের দায়িত্বও নিত্যানন্দে অর্পিত হয়েছিল। জগাই মাধাই নামেই ছিল নবদ্বীপের জমিদার তথা শাসক, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল নৃশংস শোষক। তাদের বর্বরতায় একটি বিরাট অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। মানুষরূপী এই পশু দুটির অত্যাচারে কত মায়ের সতীত্ব যে বিনষ্ট হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। নিজেদের কুৎসিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে এরা নির্বিচারে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কত পিতা-মাতার পুত্রশোকের এবং কত নারীর বৈধব্যের কারণ এই মদমত্ত জগাইমাধাই। সেইসব অত্যাচারিত মানুষ বুকফাটা কান্নাতেই মনের শান্তি লাভ করেছে, ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সব অত্যাচারই সহ্য করে নিয়েছে। কিন্তু সহ্য করেন নি নিমাই। এই সব অত্যাচার নিমাইয়ের অন্তরে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করেছে ক্ষোভের পাহাড়। বিশ্বম্ভর কীর্তন-আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন, সমস্ত ভেদাভেদ ভেঙে দিয়ে কীর্তন উত্তাল বেগে এগিয়ে চলেছে। কীর্তনের অগ্রগতিতেও জগাই-মাধাই উত্তেজিত, ক্রোধান্বিত। জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচার থেকে সকলকে রক্ষা করার সংকল্প নিশ্চয়ই ছিল শ্রী গৌরাঙ্গের মনে। নিত্যানন্দকে উপযুক্ত মনে করে তাইতো তিনি তাঁকে পাঠালেন সেই কঠিন কার্য সমাধা করতে। মাধ্যম হিসাবে কীর্তনকেই বেছে নিলেন নিত্যানন্দ। এগিয়ে চললেন তিনি জগাই-মাধাইয়ের সন্ধানে। দেখা হতেই দেখলেন ওরা মদমত্ত। মুখে ওদের অশ্রাব্য ভাষা।

কীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ এগিয়ে যেতেই ক্রোধে ফেটে পড়লো ওরা দুজনে। ইতস্তত করলেন না নিত্যানন্দ, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর আগমন তাতেই ধীরস্থির রইলেন তিনি। বাহু প্রসারিত করে ওদের বুকে তুলে নিতে আরও এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বিনিময়ে মাধাই কলসীর কানায় সজোরে আঘাত করলো নিত্যানন্দের কপালে। রক্ত ঝরলো, রক্তের স্রোত বইলো। নিত্যানন্দ পিছোলেন না, বরং বললেন –"মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি। তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।" অঝোরে রক্ত ঝরছে যাঁর কপাল থেকে তাঁর মুখে এই উক্তি! স্তম্ভিত হলো জগাই, নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। দেখলো তাঁর ক্ষমাসুন্দর মূর্তি। নেশার ঘোর কেটে গেলো তার। মাধাই আবার আঘাত করতে উদ্যত হলে তাকে নিরস্ত করলো সে। এদিকে সংবাদ পেয়ে ত্রস্তপদে শ্রীগৌরাঙ্গ এসে উপস্থিত হলেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় ওদের উপর তিনি বিরক্ত ছিলেন। এখন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত নিত্যানন্দের উপর আঘাতে তিনি উত্তেজিত হলেন। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন। কিন্তু নিরস্ত হলেন নিত্যানন্দের আবেদনে। মাধাইয়ের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ইতিমধ্যে। আত্মসমর্পণ করেছে তারা। নিমাই নিতাইও তাদের ক্ষমা করে বুকে তুলে নিয়েছেন। নিত্যানন্দের এই ক্ষমা দুর্বলের ক্ষমা নয়, এই ক্ষমা সবলের। কলসীর কানার আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও তিনি যন্ত্রণায় কাতর হলেন না, সেখান থেকে পালাবার ইচ্ছা জাগলো না, আত্মিক বলে বলীয়ান নিত্যানন্দ ওদের উদ্ধারের জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। নিত্যানন্দের ক্ষমা তাদের পাশবিক কুকর্ম বাড়াতে সাহায্য করেনি, বরং তাদের পরিবর্তিত করেছে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, সাধক-জীবনে রূপান্তরিত হয়েছে তারা। অন্তরের করুণাধারাই নিত্যানন্দের আত্মিক-শক্তির উৎস। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভাষায় তাঁর যথার্থ পরিচয় – "দয়াল নিতাই পর দুঃখ জানে। অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে।"

কীর্তনের অগ্রগতি এখন আর নদীতে দাঁড়িয়ে নেই, সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে জনস্রোতে। এই অগ্রগতিতে ক্ষেপে গিয়েছে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকগণ। অভিযোগ জানিয়েছে তারা কাজির দরবারে। কাজি কীর্তন বন্ধের আদেশ দিয়েছেন, আদেশ অমান্যে মৃত্যুদণ্ডের কথা ঘোষণা করেছেন। নিষেধাজ্ঞা শুনে গর্জে উঠেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, কীর্তনের মধ্য দিয়েই কীর্তন বন্ধের আদেশের বিরোধিতা করবেন বলে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আহ্বান জানিয়েছেন নবদ্বীপবাসীকে। জন থেকে সৃষ্টি হয়েছে জনসমুদ্র। কাজির দরবারকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করতে কীর্তনকে চারটি সম্প্রদায়ে ভাগ করে দিয়েছেন তিনি। প্রথম দলের নেতৃত্বে বরণ করেছেন অদ্বৈত আচার্যকে, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব পেয়েছেন ঠাকুর হরিদাস, তৃতীয় দলের নেতা হয়েছেন শ্রীবাস। চতুর্থ অর্থাৎ প্রধান দলের নেতৃত্বে থাকলেন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে, কিন্তু সঙ্গে রাখলেন নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ, তাঁর অভিন্ন হৃদয়, তাঁর পরামর্শদাতা। উভয়ের এই সম্মিলিত অভিযানেই সেদিন চাঁদ কাজি পর্যুদস্ত হয়েছিলেন, কীর্তনের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাই তো সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প তিনি প্রথমেই প্রকাশ করেছিলেন নিত্যানন্দকে। যেদিন শেষরাতে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করলেন, সেদিন পূর্বাহ্নেই তাঁর সঙ্কল্পের কথাও নিত্যানন্দকে জানিয়েছিলেন। আবার শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রাণ পুরুষ। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছেন শুনে নিত্যানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছেন কাটোয়ায় আর সন্ন্যাস শেষে ভাব-বিভোর শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবনের পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ এভাবে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সকলের স্বার্থে একাজ করেছিলেন বলে তিনি একে ছলনা মনে করেন নি একবারও।

DO NOT COPY

শ্রীচৈতন্য মা আর ভক্তগণকে নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরে নিয়ে আসতে নিত্যানন্দকেই পাঠিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দের দেহে যেন সহস্রগুণ বল এসেছে। তিনি পায়ে হেঁটে আর গঙ্গায় সাঁতার কেটে নবদ্বীপে এসেছেন এবং শচীদেবীকে নিয়ে শান্তিপুরে পৌঁছেছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে যে কীর্তন ও ভোজন হয়েছিল সেখানেও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ। শান্তিপুর থেকে শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে যাত্রার সময়ও নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভাব বিভোর শ্রীচৈতন্যের দেহে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য তিনি তাঁর কাছে কাছেই থেকেছেন। নীলাচলেও সবসময় তিনি তাঁর প্রাণপুরুষকে চোখে চোখে রেখেছেন।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলনের পর থেকে এ পর্যন্ত নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন নি। এবার শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই নিত্যানন্দ এবারও তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু সম্মত হলেন না শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবনের কথা বলে যিনি নিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপে তাঁকে শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নেবেনই বা কি করে? শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে তীর্থ পরিক্রমা করা। তাই তিনি কাউকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেই ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কষ্টের কথা ভেবে তাঁকে স্বাধীনভাবে তীর্থ পরিক্রমা করতে যদি বারণ করেন এবং ভক্তের ইচ্ছার মর্যাদা না দিয়ে তিনি যদি তাঁদের বেদনার কারণ হন, এই উভয়ই যে শ্রীচৈতন্যের কাছে অসহ্য। আবার নিত্যানন্দের কাছে অসহ্য শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদ-বেদনা। সেই অসহ্য অবস্থাকেও মেনে নিতে হলো নিত্যানন্দকে। কিন্তু শ্বাপদসংকুল জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণ ভারতের পথে ঘাটে শ্রীচৈতন্যকে একা ছেড়ে দিতেও তো তাঁর প্রাণ চায় না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিতে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে রাজী করালেন, আর এতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

DO NOT COPY

কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। আলালনাথ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চোখের জলে শ্রীচৈতন্যকে বিদায় দিয়ে এলেন তিনি। শ্রীচৈতন্য যতদিন দক্ষিণ ভারতে ছিলেন সেই সুদীর্ঘ সময় প্রতি মুহূর্ত নিত্যানন্দ তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন নীলাচলে বসে, এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি আর নবদ্বীপে ফিরে যান নি। দক্ষিণ ভারত পর্যটন শেষে প্রত্যাগত শ্রীচৈতন্যকে আলালনাথে অগ্রবর্তী হয়ে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন নিত্যানন্দ আনন্দাশ্রুর মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে।

তারপর পুরীতে বসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের আনন্দেই কাটছিলো দিনগুলি। সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য ও অচল জগন্নাথ জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিদিন দর্শন করে আনন্দ সাগরেই ভাসছিলেন তিনি। রথযাত্রায় রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে নৃত্য করে সারা ভারত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের তিনি আনন্দ দিয়েছেন। সেই সময় অদ্বৈত আচার্য সহ সকল ভক্তের সঙ্গে তিনিও শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা ঘোষণা করেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সম্মুখে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বর্ষে শ্রীচৈতন্যের গৌড় ভ্রমণের সময় পুরীতে গোঁসাই স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই প্রমুখ বহু ভক্তের সঙ্গে ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দও।

পুরীতে বসে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে উড়িষ্যার সুবিখ্যাত পঞ্চমনার অন্যতম মনা অনন্তকে দীক্ষা দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ।

এবার মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে একদিন বললেন – "শ্রীপাদ, তুমি আর নীলাচলে এসো না। বঙ্গভূমিতে থেকেই তুমি সেখানে

আচণ্ডালে নাম-প্রেম বিতরণ কর আর সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে উদার মানব ধর্ম প্রচার কর।"

শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে থাকবার মনোবাসনা থাকা সত্ত্বেও একনিষ্ঠ সৈনিকের মতই তিনি সে নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। বঙ্গভূমিতে ফিরে এসে ভক্তদের নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্য-ভজনের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ বঙ্গভূমিতে কোন কোন গ্রামে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন জয়ানন্দ তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে।' এইভাবে গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার কালেই পানিহাটিতে রঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা করেছিলেন তিনি।

শ্রীচৈতন্য দর্শনের অত্যুগ্র অভিলাষে আর প্রাণের আকর্ষণে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুরও আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন, নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বার দুই নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ লাভ করেছিলেন।

আজীবন সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের জীবনে এবার আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো – গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবীকে বিয়ে করে তিনি সংসারী হলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মতে, মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে বিবাহিত জীবন যাপন করেন। সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে সেই রকম আদেশ দিলেও দিতে পারেন। নিত্যানন্দ সম্ভবতঃ খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের নির্মিত বাসগৃহে বিবাহিত জীবন যাপন করেন। তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে; নাম গঙ্গামাতা। পুত্র বীরচন্দ্রের জন্ম হয় বসুধার গর্ভে। পিতার মতই বীরচন্দ্র ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, অসীম সাংগঠনিক শক্তি ছিল

DO NOT COPY

তাঁর। বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর কম ভালোবাসা ছিল না। তিনি কয়েক হাজার বৌদ্ধ তান্ত্রিককে মহাপ্রভুর উদার মানব ধর্মে দীক্ষিত করেন। আসাম মণিপুরের অনেক আদিবাসীকেও তিনি এই ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাঁদেরকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেন। বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়েছিলেন জাহ্নবী দেবী। বীরচন্দ্র এক সময়ে খড়দহ থেকে যাত্রা করে সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অম্বিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কণ্টকনগর ও খেতুরি হয়ে বৃন্দাবন গেছিলেন। রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে মিলন হয়েছিল তাঁর। সর্বত্রই তিনি সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। বীরচন্দ্রের প্রসাদ মালা পেয়েই জয়ানন্দ 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষায় আদি চরিত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী চৈতন্য ভাগবত'ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচনা করেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি ব্যাসাবতার আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। সেই কারণেই নিত্যানন্দ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এমন প্রতিভাসম্পন্ন যুবককে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন, তাঁকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। বৃন্দাবন দাসের মায়ের নাম নারায়ণী, তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃজায়া, আর 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের মতে বৃন্দাবন দাসের পিতার নাম বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপের কাছে মামগাছিতে। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী দেবীর পিতৃগৃহ এই মামগাছিতে।

বৃন্দাবন দাস মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই নারায়ণী পতি-হারা হয়েছিলেন, আর তখনই পিতৃ ও পতিহারা গর্ভবতী ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ গৃহে এনে রেখে এসেছিলেন। মামগাছিতে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় এবং বাল্যও কাটে

DO NOT COPY

তাঁর সেখানে। নারায়ণী মহাপ্রভুর আশীর্বাদ ধন্যা আর তিনি ছিলেন সতী-সাধ্বী। সেই কারণে বৃন্দাবন দাস মায়ের মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করেছেন বারে বারে।

নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী ছিলেন বিদূষী। ভক্তদের কাছে অশেষ শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেছিলেন। গৌরাঙ্গ স্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করে তিনি বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। সর্বত্রই এই বিদুষীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রচেষ্টায় খেতুরীতে যে মহাধর্ম সম্মেলন হয়েছিল, তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন জাহ্নবীদেবী। তখন নিত্যানন্দ প্রভু জীবিত ছিলেন না।

নিত্যানন্দ ভাবের মানুষ। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। পরবর্তী কালে হলেন গৃহী। প্রথম জীবনে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ত্যাগব্রতে, পরবর্তী জীবনে গ্রহণ করলেন ভোগকে। এই যে তাঁর জীবনে এতো বৈচিত্র্য তা সম্ভবতঃ তিনি ভাবের মানুষ বলেই, বিশেষ কোন সংস্কারের দাস তিনি ছিলেন না বলেই। তিনি সদা আনন্দময়। তাই ত্যাগ আর ভোগ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আনন্দ। তবে মহাপ্রভুর নির্দেশ পালনেই তাঁর আনন্দ সর্বাধিক। তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সারাজীবন মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তিনি যেচে যেচে সাশ্রু নয়নে বলেছেন, তোমরা অমৃত পুরুষ শ্রীচৈতন্যের নাম কর, তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভজনা কর। প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানে তাঁর আনন্দময় জীবনে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিলো। প্রবাদ আছে, মহাপ্রভুর তিরোভাবের কয়েক বছরের মধ্যেই নিত্যানন্দও দেহত্যাগ করেন। এও প্রবাদ রয়েছে যে, ১৪৬৪ শকাব্দে (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব ঘটে।

DO NOT COPY

(তিলোত্তমা কাহিনী)

(১)

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে, পাঁচভাই পান্ডবেরা দৌপদীকে নিয়ে নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে সবে বসবাস সুরু করেছেন। এমন সময় নানাদেশ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে উপস্থিত। মুনিকে দেখে সকলেই মহাখুশি। যথারীতি পূজার্চনার পরে, একই সঙ্গে পাঁচ ভাইকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন তাঁদের নারদ, - 'দ্যাখো, তোমরা পাঁচ ভাই, আর একা দ্রৌপদীই তোমাদের ধর্মপত্নী। এ অবস্থায়, তোমাদের মধ্যে আগে থেকেই এমন কিছু একটা ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিৎ, যার ফলে তাকে নিয়ে কখনও কোন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটতে না পারে।' নারদ তিনযুগেই অমর; আর ত্রিভুবনে যেখানে যা ঘটে, সব কিছুই তিনি জানতে পারেন। কাজেই, তিনযুগের মধ্যে স্ত্রীলোক নিয়ে কোথায় কোথায়, কবে কবে, কোন কোন মারামারি-কাটাকাটি, এমন কি প্রাণান্তকর ঘটনা ঘটেছিল, সে সব তো তাঁর জানতে বাকী নেই। কথাপ্রসঙ্গে এমনি একটা কথাই তিনি শোনালেন এখন পাণ্ডবদের, যাতে করে প্রথম থেকেই তাঁরা দ্রৌপদীকে নিয়ে ঠিক পথে চলতে পারেন। সাধুর কাজই তো হল অন্যের মঙ্গল-চিন্তা করা - নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্যকে সৎপথে চলতে সাহায্য করা! বিশেষতঃ নারদের মতো দেবর্ষির পক্ষে আর কথা কী - যাঁর কাজই হচ্ছে বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গেয়ে গেয়ে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করে বেড়ানো? কোথায় বালক ধ্রুব 'হরি! হরি!' করতে করতে বনের মধ্যে কাহিল হয়ে পড়েছে, ছুটলেন অমনি সেখানে নারদ; ধ্রুবের কানে মন্ত্র দিয়ে করে দিলেন তার হরিপাদপদ্মলাভের উপায়! করতে হবে হরগৌরীর মিলন, ঘটকালির ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন নারদ গিরিরাজ-ভবনে। রাজসূয়-যজ্ঞ করতে চান যুধিষ্ঠির। বড়

কঠিন কাজ! আগে থাকতে তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্য কত কথার অবতারণ! প্রভাসে যজ্ঞের আয়োজন করছেন কৃষ্ণ-বলরাম। গোপ-গোপীদের নিমন্ত্রণ করা হয় নি। এ আবার কেমন কথা? যজ্ঞের খবর দিতে হঠাৎ ব্রজপুরীতে নারদের আবির্ভাব! যেখানেই ভক্ত-ভগবানের লীলা, সেখানেই নারদ - কখনো গড়ে তোলা, কখনও ভেঙ্গে ফেলা, আবার কখনো বা ভাঙ্গাচোরা জিনিষে জোড়াতালি-লাগানোর কাজে!

(২)

যাহোক আরম্ভ করলেন এবারে নারদ, সেই অনেক কাল আগেকার সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুটি দানবের কথা। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে এক মহাবলশালী দৈত্য ছিল। তারই দুই ছেলের নাম সুন্দ-উপসুন্দ। বাপের মতোই এরাও ছিল নিতান্ত দুর্দান্ত। কিন্তু দু'ভাই-এর মধ্যে গলায় গলায় মিল! খাওয়া পরা, চলন বলন হুবহু একই রকমের। কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। [কথাচ্ছলে যেন এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলেন নারদ পাণ্ডবদের -তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে এই যে মিল, এর চাইতে অনেক-অনেক বেশী মিল ছিল কোন এক সময়ে সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যেও]। দিন যায়। কিছুদিন পরে দু'ভাই মিলে মতলব আঁটলো - কঠোর তপস্যায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে খুশি করে, তাঁর বরে তারা তিনলোক জয় করবে। [আমাদের শাস্ত্রপুরাণে অনেক অদ্ভুতকর্মা দানব বা রাক্ষসদের কথা শোনা যায়। এদের মধ্যে অনেকে ছিল বেদপন্থী। কেউ কেউ আবার ছিল পরম শিবভক্ত - যেমন জরাসন্ধ প্রভৃতি। সকাম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও করতো এরা কখনো কখনো। মূল বাল্মিকী রামায়ণেও শুনতে পাওয়া যায় রাবণের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের কথা]। দানব বা রাক্ষসেরা প্রায় সকলেই রজোগুণ প্রধান, তাদের শরীর ও মন ছিল অমিত বলশালী। কাজেই সুন্দ উপসুন্দের পক্ষেও কোন কাজই অসম্ভব ছিল না। যাহোক, তাদের ঘোরতর তপস্যা দেখে দেবতারা তো ভয়ে অস্থির! শুরু হয়ে গেল দৈবী

মায়ার খেলা,-কি করে তাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটান যায়, চলতে থাকল তারই ক্রমাগত চেষ্টা। কিন্তু অবিচল সাধনার ফলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করল দু' ভাই। তুষ্ট হয়ে দেখা দিয়ে বললেন ব্রহ্মা - কি বর চাই তোমাদের? উত্তরে, চেয়ে বসল দুজনে - সর্ব বিদ্যায় সাফল্য, সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান, অমিত বলবীর্য ও সেই সাথে অমরত্ব লাভের বরও। অন্য সব বর দিতে এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন ব্রহ্মা, কিন্তু অমর-বর দেওয়া যায় কেমন করে? যেখানে জন্ম, প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু তো সেখানে হবেই হবে। কাজেই কোন ক্রমেই পেরে উঠলেন না ব্রহ্মা তাদের অমর-বর দিতে। তাহলে উপায়? চালাকি করে বলল এবারে দুভাই ব্রহ্মাকে - বেশ তো, তবে এই বর দিন যাতে নিজেরা মারামারি করে মরা ছাড়া, অন্যের পক্ষে আমরা অবধ্য হতে পারি। মতলবটা এই - দুভাই-এর মধ্যে যখন তাদের এতটাই মিল, তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তারা যে কখনো মরতে পারে - এটা তো কল্পনার অতীত! কাজেই এতে করে তাদের অমরত্ব লাভ করা হবে। এমনই করেই, এই দৈত্য বংশের আরও অনেকেই বিধির বিধানকে ফাঁকি দিয়ে অমর হতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, তাদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে অচিন্ত্যপথে মৃত্যু এসে শেষ পর্যন্ত সকলকেই একদিন গ্রাস করে ফেলেছিল! সে যা হোক, এরপর একটু হেসে দু'ভাইকে তাদের মনের মতো বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ব্রহ্মা।

(৩)

বর পেয়ে দৈত্যপুরীতে আর আনন্দ ধরে না! অন্যদিকে দৈত্যদের অত্যাচারে ত্রিভুবন হয়ে উঠেছে অস্থির! দেবতারাও সেইসাথে ঋষি ও সিদ্ধেরাও সকলে মিলে দেখা করলেন ব্রহ্মার সাথে, জানালেন তাঁকে তাঁদের দুর্দশার কথা। সব কথা শুনে, উপায় ঠাওরাতে কিন্তু একটুকুও দেরী হল না ব্রহ্মার পক্ষে। সৃষ্টি বা সৃজনের মধ্যেই তো নিহিত থাকে বিসৃষ্টি বা বিসর্জনের বীজ। জীবনের মাঝেই তো লুকিয়ে আছে

মরণের চিহ্নও। তাছাড়া এক্ষেত্রে বিলক্ষণই জানতেন ব্রহ্মা - তাঁর নিজের দেওয়া বরের মধ্যেই অন্যের অলক্ষ্যে করা আছে ধ্বংসেরও ব্যবস্থা। যতক্ষণ ভাইয়ে ভাইয়ে মিল, ততক্ষণই জীবন। কিন্তু যে মুহূর্তে অমিল, তখনই ঘনিয়ে আসবে তাদের মরণ! তাই এখনকার একমাত্র কাজ - এই অমিল ঘটানোর মতো কোন একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা, দু'ভাই এর মধ্যে এখন যে টান - যে আকর্ষণ, তা থেকে জোরালো কিছু একটা গড়ে তোলা। কাজেই ডাক পড়ল দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার। ব্রহ্মার আদেশে, জগতের সবকিছু সুন্দর জিনিষ থেকে তিল তিল করে নিয়ে নিয়ে সৃষ্টি করলেন বিশ্বকর্মা এক অদ্ভুত নারীমূর্তি! তিল তিল করে নিয়ে গড়া হয়েছিল বলে নাম দেওয়া হল এর 'তিলোত্তমা'। বিশ্বকর্মার কারুকার্যে দারুণ খুশি হলেন ব্রহ্মা। বিশ্বব্রহ্মান্ডে এমন কে আছে যে তিলোত্তমার রূপলাবণ্যে মোহিত না হয়ে পারবে? তবুও, যাকে বলে আগুন নিয়ে খেলা! তাই আগে থেকে একটু পরীক্ষা করে নেওয়াটা ভাল নয় কি? বেশ, তাই হোক! দেবতাদের সভা আলো করে বসে আছেন - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সেইসাথে বড় বড় ঋষিরাও। হঠাৎ সেখানে বিধাতার নির্দেশে সুন্দরী তিলোত্তমা গিয়ে হাজির! হৈ হৈ পড়ে গেল দেবসমাজে! একইসঙ্গে সকলেরই চোখ পড়ল তিলোত্তমার উপরে। আর দেখাও গেল - একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ছাড়া কেউ-ই পেরে উঠছেন না অন্যদিকে চোখ ফেরাতে! মহাযোগী মহেশ্বর ও দেবরাজ ইন্দ্রের অবস্থা তো হয়ে দাঁড়াল আরও অদ্ভুত। যেদিকেই ঘুরতে থাকে তিলোত্তমা, সেদিকেই মহেশ্বরের একটি করে মুখ গজাতে থাকে! ইন্দ্রের তো কথাই নেই! দু'চোখ দিয়ে কতটুকুই বা দেখা চলে? কাজেই হয়ে পড়লেন তিনি একেবারে সহস্রলোচন! চমৎকার! [ভোগবিলাসী দেবরাজ ইন্দ্রের কথাটা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহেশ্বরকে নিয়েও আমাদের বৈষ্ণবপুরাণের অনেক স্থানেই এইভাবে করতে দেখা যায় অনেক রঙ্গরস! আর, যেখানে স্বয়ং শিবেরই এই অবস্থা,

সেখানে ঋষিই হোন বা যিনিই হোন, শিবভক্তের সম্বন্ধে অন্য কী আশা করা যেতে পারে?]।

(৪)

পাঠানো হল এবারে তিলোত্তমাকে সুন্দ-উপসুন্দের কাছে। সেজেগুজে ফুল তোলার ছল করে এসে দাঁড়াল সে দু-ভাই-এর সামনে। আর যায় কোথা! দু'হাত ধরে একইসঙ্গে দুজনের টানাটানি! কোথায় ভেসে গেল ভাইভাই ভাব! কোথায় রইল পড়ে মান-সম্ভ্রম, ত্রিভুবনের রাজ্যপাট! আরম্ভ হয়ে গেল দু'ভাই-এর মধ্যে বাকযুদ্ধ ও তারপর ভীষণ গদাযুদ্ধ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত দুজনেরই হল প্রাণান্ত। তিলোত্তমার কার্যকলাপে এবারের মতো বেঁচে গেলেন দেবতারা অসুরের হাত থেকে। কিন্তু পাছে তাকে নিয়ে দেবতা বা ঋষিদের নিজেদের মধ্যেও আবার মারামারি-কাটাকাটি লেগে যায়, এই ভয়ে ব্রহ্মা এখন তাকে একেবারে সকলেরই কাছে অদৃশ্য করে দিলেন - মিশিয়ে দিলেন সূর্যতেজের সাথে!

নারদের মুখ থেকে এইভাবে তিলোত্তমার কাহিনীটি শোনার পরে, স্থির করে ফেললেন পাণ্ডবেরা - তাঁদের মধ্যে কোন একজন যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে একান্তে থাকবেন, তখন অন্য আর কেউই সেখানে যেতে পারবেন না। যিনিই হোন না কেন, এর অন্যথা করলে, তাঁকে বারো বছর বনবাস করতে হবে। দেখা যায়, এরপর একদিন কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই এ নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে তৃতীয় পান্ডব অর্জুনকেই যেতে হয়েছিল বনবাসে। তবে সে অন্য কথা।

DO NOT COPY

সার্থক ভ্রমণ আমার **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

পূবের মুন্নার আর পেরিয়ারের পর পশ্চিমে ব্যাকওয়াটারের স্বাদ আল্লাপূঝায় মিটিয়ে নিয়ে এবার কোভলম চলার পালা। আলেপ্পি থেকে ১৭৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ছোটার পথে ১৫২ কিলোমিটার পার হলে আসে শ্রীপদ্মনাভস্বামীর মন্দির। মন্দির ছাড়াও তিরুভনন্তপুরমে পুভারের ব্যাক ওয়াটার, পাহাড়ি পোনমুড়ি, ভারকালা এবং অবশ্যই রয়েছে কোভলমের সাগর সৈকত। মুন্নার আর আলেপ্পি দেখার পর ৩৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার দৌড়াদৌড়ি করে পাহাড় অথবা ব্যাক ওয়াটার দেখার সময় আমাদের ছিল না। আর ভারকালাকে বুড়িছোঁয়া না করে ছুটলে দেবতা না হোক তার বিগ্রহ আমাদের ফাঁকি দিতেই পারতো। শ্রীপদ্মনাভস্বামীর মন্দির যে ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত বন্ধ। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের গৃহদেবতা এই পদ্মনাভস্বামী। জনশ্রুতি ঋষি বিল্বমঙ্গলম বিষ্ণুদর্শনের বাসনায় পথে বেরিয়ে দেখেন একটি গাছ ভেঙে পড়ে কি ভাবে তা রূপ নেয় অনন্ত শয়নে বিশ্বের বৃহত্তম বিষ্ণুমূর্তিতে। মাথার উপর ছত্রাকারে ফণা তুলে অনন্ত নাগ আর পায়ের কাছে দেবী কমলা।

দেবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে তিন দরজায় দাঁড়াতে হয়। খালিগায়ে ছেলেদের পরতে হয় ধুতি আর মেয়েদের জন্য আবশ্যিক শাড়ি। ১২ বছরের কম মেয়েরা গাউন পরে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেও জিন্স, স্কার্ট অথবা বারমুডা নৈব নৈব চ।

কোভলমে আমাদের হোটেল 'পার্ক ইন্টারন্যাশনাল' যেন এক ছড়িয়ে থাকা গোলকধাঁধা। সেই ধাঁধার রাজ্যে কে যে কোথায় হারিয়ে গেল না বুঝলেও আমাদের ১০৩ নম্বর ঘরটা ছিল লা-জবাব। ঘরের বাইরে বসার ঘর, আবার তার বাইরে সুইমিং পুলের ধারে বসতে চাইলেও চেয়ারের অভাব নেই। হাতের কাছে ঝুলন্ত নারকেল আর, অদূরে আরব সাগরের হাতছানি – এখানে সুইমিং পুলটা যেন লজ্জায় লুকাতে চাইছে। সাগরের উদ্দামতাকে উপেক্ষা করে শান্ত জলে সাঁতার দেবে কে?

দুপুরে লাঞ্চের পরে সবাই যখন একটু গড়িয়ে নেওয়ার তালে আছে, আমরা তখন চলে এসেছি অটোস্ট্যাণ্ডে। ৮০০ টাকার বিনিময়ে শঙ্খমুখম আর সমুদ্রবীচ পার্ক দেখাতে অনেকেই রাজী থাকলেও দয়ানন্দের KL-01-BA-5288 কেন বেছেছিলাম জানিনা। তবে আবার যদি কোভলম যাই, 9074556069 নম্বরেই যে ফোন করব, এটা নিশ্চিত।

এর্ণাকুলাম-কোভলম রোড ধরে ১৭ কিলোমিটার দূরে শঙ্খমুখম পৌঁছতে পার হতে হয় তিরুভনন্তপুরম এয়ারপোর্ট। কোভলম বা ভারকালার তুলনায় এক্কেবারে ফাঁকা, পুরীর সমুদ্রের তুলনায় নিতান্তই শান্ত, শঙ্খমুখমের আসল আকর্ষণ তার নির্জনতা। ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য মারমেড আর হেলিকপ্টারের মডেল আছে, খেলার ছলে শিশুদের ট্রাফিক নিয়ম বোঝাতে রয়েছে নেহরু পার্ক। কিন্তু সে সব নয়, সাদা বালির বিস্তীর্ণ নির্মল পরিবেশ, আরব সাগরের জল, সর্বোপরি নিরালা সৈকতে বিজনবাসের সুযোগটাই শঙ্খমুখমকে অনন্য করে তুলেছে।

শঙ্খমুখমের খেলা শেষ করে ফিরে চলি কোভলমের দিকে। সেই পথেই কম বেশি চার কিলোমিটার বাকি থাকতে সমুদ্রবীচ পার্ক। সৈকতের পাশে সন্ধ্যা কাটানো আর সূর্য ডুবতে দেখার এ এক সুন্দর জায়গা। দূরে সাগরের বাঁকে পাহাড়, কাছে নীল সাগরের মাতামাতি। গোয়ার সাথে তুলনা না করেও বলা যায় পরদেশী নীলনয়নাদের সাগর স্নানের দৃশ্য গোয়ার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। গোয়া অথবা কর্ণাটকের মত এতো বীচ রয়েছে কেরালায় যে এক ভ্রমণে সব কটি সূর্য ডোবার পালা দেখে ওঠা অসম্ভব। যদি জেলে হয়ে ওখানে মাছ ধরতে পারতাম, অথবা হতেম কোন অটো চালক, যে পর্যটকদের সারাদিন বিভিন্ন জায়গা দেখিয়ে শেষবেলায় নিয়ে যাবে বিদায়ী সূর্যকে সম্ভাষন জানাতে – তাহলে হয়তো একটু একটু করে কেরালা খসিয়ে ফেলতো তার অবগুণ্ঠন। কিন্তু আমরা তো সাধারণ পর্যটক, তাই সময়াভাবে কোভলমের সূর্যকেই পাখির চোখ করে দয়ানন্দকে বলি অটোর স্পীড তুলতে। শুধু তো সাগরের কোলে সূর্যের আত্মসমর্পণ নয়, পাখির চোখে কোভলমকে দেখতে হলেও চাপতে হবে এখানকার লাইটহাউসের একদম

মাথায়। দশ টাকার টিকিট কেটে ১৪২টা সিঁড়ি ভেঙে লাইটহাউসের ওপরে এলে পুরো কোভলম তো বটেই, নিকটবর্তী VIZHINJAM বীচকেও দেখে নেওয়া যায়। তাই এই লাইটহাউসকে শুধু কোভলম নয় ভিঝিনজাম লাইটহাউসও বলা হয়। পরদিন সাতসকালে আবার এসেছিলাম সাগরপারের গোপনপুর যদি কিছু থাকে তাকে খুঁজে পেতে। জেলেদের মাছধরা দেখতে আসতেই হয় হাওয়া বীচে। সেখানকার কফিশপের কফিতে উজ্জীবিত হয়ে শেষতম বীচের আদিম চেহারা দেখতে যাওয়াই যেত, কিন্তু পিছুটান আবার ফিরিয়ে আনে লাইটহাউস বীচে। দোকান পাট, যাত্রীর আধিক্য, হোটেলের ভিড়, এমন কি আমাদের হোটেলও যে এই লাইট হাউস বীচে।

একটু বেলায় অফিস লাঞ্চের নামে ফ্রায়েড রাইস, আলুর দম, চিলি চিকেন আর চাটনি চেটে বাসে উঠতেই দেখি সেও যেন খুশি হয়ে উঠেছে তিন সাগরের মেলামেশার গন্ধ পেয়ে। আজ যে আমাদের গন্তব্য ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের সাগর-সঙ্গম শহর কন্যাকুমারী। কোভলম থেকে সাতাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এলাচ পর্বত শ্রেণীর (Cardamom Hills) দক্ষিণতম প্রান্ত এই কন্যাকুমারী। আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে মাদুরাই থেকে যে পথে নাগেরকয়েল হয়ে কন্যাকুমারী এসেছিলাম আজ অন্য পথে এলেও সেই নাগরাজা মন্দিরের শহর ছুঁয়েই আবার এলাম এই বারের ভ্রমণের শেষ গন্তব্য দক্ষিণ ভারতের শেষ বিন্দুতে। দুপুর ঠিক আড়াইটেতে যে হোটেল সান ওয়ার্ল্ড-এ আমাদের ঠাঁই মিললো আশ্চর্য হলেও সত্যি যে কুড়ি বছর আগে আমরা ছিলাম ঠিক তার পাশের হোটেল ট্রাই-সি লজে। সেই পুরানো লজ অবশ্য দামে মানে অনেক বেড়ে হোটেল ট্রাই-সি হয়েছে। কিন্তু তাতে কি আর পুরানো দিনগুলো নতুন করে মনে না এসে পারে?

আজ সকাল বেলায় কোভলমের সাথে মাখামাখি, তারপর বিষ্ণুবাসের গদাইলশকরি চালের ঠেলায় শরীর একটু বিশ্রাম নিতে চাইলেও মন তাকে ঠেলে নিয়ে এল লঞ্চঘাটের সামনে। সেদিনের শেষ লঞ্চ বিকেল চারটেয় ছেড়ে এলেও ঘাটের কাছের কোনো পছন্দসই জায়গা থেকে মনটাকে তো ১৮৯২ সালের

ডিসেম্বরে নিয়ে যাওয়াই যায়। তেমনই এক জায়গা দেখলাম, ভারত মহাসাগরের বুকে মানুষের তৈরি আন্দাজ শ' পাঁচেক মিটারের এক পাথরে বাঁধানো ব্রিজ। একশো মিটারের বেশি হাঁটলেই কন্যাকুমারীর হৈ-চৈ পেছনে পড়ে থাকে – নিশ্চিন্তে তাকিয়ে দেখুন অদূরে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রক, আর স্মরণ করুন ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যাওয়ার আগে ভারতভূমির দক্ষিণতম প্রান্তে তার তিনদিন ব্যাপী ধ্যানের কথা। আগামী কাল সে পুণ্য শিলায় আবারও আমরা যাওয়ার সুযোগ পাবো। আপাতত শংকরাচার্য্য মন্দির আর গান্ধীমণ্ডপম দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি এখানকার সানসেট ভিউ পয়েন্টের দিকে। গান্ধীমণ্ডপমে স্বভাবতঃই গান্ধীভক্তদের ভিড় জমেছে, কারণ তাঁর চিতাভস্মকে সঙ্গমে বিসর্জনের আগে তা রাখা হয়েছিল এই মণ্ডপমেই। কিন্তু এখানকার কুমারী মন্দিরের সামনেই যে তিন সাগরের সঙ্গম সে কথা দেখলাম অনেক পর্যটকই জানেন না। অটো চালকেরাও এই সুযোগে সঙ্গম দেখাবার নামে তাদের কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে! এমন কি যে সানসেট ভিউ পয়েন্টের দূরত্ব মণ্ডপম থেকে তিনশো মিটারও হবে না, সেখানেও ঘুরপথে নিয়ে চলার জন্য অটোর দল হুজুরে হাজির। ঠিক এই ব্যাপারেই কেরালার সাথে তামিলনাড়ুর তফাৎ। কেরালায় অটো চালক কাউকে এমন ভুলভুলাইয়ায় ঘোরাবে না। আমরা ভিউ পয়েন্টে পৌঁছেছিলেম ঠিকই, কিন্তু সূর্য-সাগরের সাক্ষাৎকারটা প্রত্যক্ষ করতে পারলাম না মেঘের দল বাগড়া দেওয়ায়। তবে মধুর-মিলন দৃশ্যটা যে মেঘের দল দেখেছে তা নিশ্চিত, না হলে কালো ঘনশ্যামে এমন লালের ছোঁয়া লাগে? পরদিন সেই মেঘেরাই আবার পর্দা ঝুলিয়েছিল সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে, তবে আকাশজুড়ে অরুণ আগমনী বাণী দিব্যি বুঝিয়ে দেয় যবনিকার অন্তরালে কি ঘটে চলেছে। শুধু আকাশ নয়, কুমারী মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের উৎস থেকে বিবেকানন্দ রককে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করতে দেখাও কি কুমারী ভোরের পরম পাওনা নয়?

সাত সকালে নাকে মুখে সামান্য কিছু গুঁজে লঞ্চঘাটের কাউন্টারে এসে দেখি আমাদের চেয়ে ব্যস্তবাগীশ দর্শনার্থী নেহাৎ কম নয়। আঁকাবাঁকা লাইনটা মিনিট

কুড়িতে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার পর লঞ্চের ভেতর মহলে ঢুকতে আরো মিনিট বিশ। ৫০০ মিটার সাগর পারাপারের খরচ জনপ্রতি ৭৫ টাকা। মিনিট দশেকে সাগরের ভগ্নাংশ পেরিয়ে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল রকে পৌঁছাবার পর দর্শনের জন্য আবার দর্শনী দিতে হয় দশ টাকা হিসেবে। মেমোরিয়ালে আট ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জ মূর্তিতে বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর তেজোদীপ্ত জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়ে তোলা কি এতই সহজ? এখানে আরো দেখতে পাবেন কাঁচের আধারে পবিত্র শিলায় কন্যাকুমারীর পায়ের ছাপ। তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে মূল ভূখণ্ডের ভগবতী কুমারী আম্মান বা দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির তিন হাজার বছরের প্রাচীন। ১৮৯২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে দেবী দর্শন করেছিলেন। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সাঁতরে পৌছেছিলেন পবিত্র শিলায়। তাঁর তিন দিন ব্যাপী ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে কুমারী দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মেমোরিয়ালের নীচের তলায় মেডিটেশন হল। ওঙ্কার ধ্বনি শুনতে শুনতে আর সবুজ আলোতে সেই ওঙ্কার প্রত্যক্ষ করে ভক্তজন চেষ্টা করছে মনের গভীরে তলিয়ে একবার সেই পরমপুরুষকে উপলব্ধি করার। কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা ! শান্তমনে দশ মিনিট বসবেন কি, লোকের যাতায়াতের শব্দ আর ‘চুপ চুপ’ আওয়াজে আমার মত সাধারণ লোকের ধ্যানভঙ্গ হতে বাধ্য – সবাই তো স্বামী বিবেকানন্দ হয় না!

মেমোরিয়াল রকের পাশে অন্য এক শিলাখণ্ডে ২০০০ সালের পয়লা জানুয়ারী নির্মিত হয়েছে ১৩৩ ফুট পাথরের তামিল কবি থিরুভাল্লুভরের মূর্তি। কবি ও দার্শনিক হিসেবে যতই প্রসিদ্ধি থাক, তামিলনাড়ু সরকার আলোরমালায় মুড়ে যতই কবিকে ভারতখ্যাত করে তুলতে চেষ্টা করুক, বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দের স্মৃতিতে তৈরি মন্দিরের পাশে আকাশছোঁয়া কবিমূর্তি নিতান্তই বেমানান।

মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসার পর দেখাই যেত ১৩ কিলোমিটার দূরের শুচিন্দ্রামে থানুমালয়ান মন্দির অথবা ৫৫ কিলোমিটার দূরের বীরভদ্রের মন্দির ও থিরপারাপ্পু জলপ্রপাত। কেউ ছুটেছিল ভাট্টাকোট্টাই ফোর্ট অথবা মাথুর ঝুলন্ত সেতু দেখতে। আমরা মনেপ্রাণে কি চেয়েছিলাম সে কথা থাক, তবে বিকেলের মেঘের দল পাড়া

বেড়াতে চললেই বুঝতে পারি ইচ্ছে পূরণ আসন্নপ্রায়। সমুদ্র-সবুজ বঙ্গোপসাগর আর ঘন নীল ভারত মহাসাগরের সঙ্গ ছেড়ে বাদামী-গোলাপী আরব সাগর যখন সূর্যের দিকে হাত বাড়ায়, লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও সবিতা তাকে নিরাশ করেনা। টুপ করে লুকিয়ে পড়ে বিশাল বুকের বিস্তারে। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি, অনুভব করি – কন্যাকুমারী ভ্রমণ আমাদের সার্থক।

কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলা ও কবি থিরুভাল্লুভরের মূর্তি

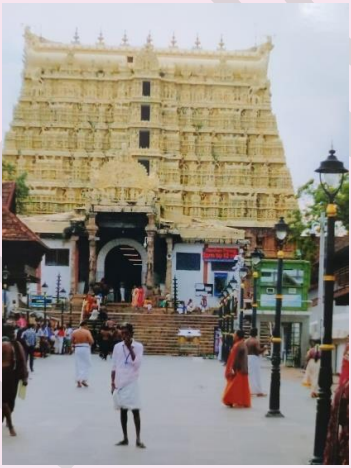

শ্রীপদ্মনাভস্বামীর মন্দির

কোভলম সৈকত

মরণোত্তর **সুনন্দন ঘোষ**

আমার এই শরীর যখন একমুঠো ছাই হয়ে যাবে,
তখনও তোমার মনের মধ্যে ধরা থাকবে আমার দুটো হাত।
বৃষ্টির বিকেলে যখন দাঁড়াবে তিনতলার বারান্দায়,
তখনও দেখবে হেঁটে যাচ্ছি আমি আর তুমি ।
আমাদের নৌকোর ছায়া পড়বে
ডাউকির স্বচ্ছ জল ভেদ করে,
স্মিথ আইল্যান্ডের বালিয়াড়িতে, শোনমার্গের তুষার প্রান্তরে
থেকে যাবে পদচিহ্ন .....

হাস্পাতাল, রাতজাগা, চোখের জল,
সব ঝাপসা হয়ে আসবে একদিন,
সংশয়, উদ্বেগ, উল্লাস – সব অতীত হয়ে যাবে,
ভালবাসা রয়ে যাবে হলুদ ঘাসের মত
ক' ফোঁটা জলের অপেক্ষায় .....
কোষ থেকে কোষান্তরে থেকে যাবে আমার স্বাক্ষর।

DO NOT COPY